ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ*

সারসংক্ষেপ: পঞ্চাশের দশকের একজন শক্তিশালী কবি ব্যক্তিত্ব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০১)। তিনি 'সাতনরী হার'(১৯৫৫) কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা কাব্যাঙ্গনে অভিষিক্ত হন। তারপর একে একে মোট সাতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ঐতিহ্যসংলগ্ন কবি; ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সমকালীন জীবনব্যবস্থা তাঁর কাব্যে স্বাতন্ত্র্যিক বিন্যাসে প্রযুক্ত। লোকছড়া ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ক উপাদানে তার কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি আপন পরিচয় বিনির্মাণে সতত প্রয়াসমান ও নিবেদিতপ্রাণ। জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর কাব্যে এক অনন্য মাত্রা সংযুক্ত করেছে। তিনি একদিকে রাজনৈতিক মিছিলের অগ্রবর্তী সৈনিক, অন্যদিকে কলম হাতে বিনিদ্ররজনীর কাব্য-সাধক। তাই সবার সঙ্গে তার আত্মার সংযোগ সংস্থাপিত হয়। রাজনৈতিক সর্তক সচেতনতা তার কাব্যে লক্ষণীয়। 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি', অথবা 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা'র মতো কবিতা রচনা করে তাঁর আন্তরিক মনোবাসনা ও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাথে সম্পাদিত হয়েছে তার সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ।

'সাহিত্যের প্রাচীন শাখা কবিতা। হাজার বছরের বাঙালির জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কবিতা। চর্যাপদ থেকে অদ্যাবধি ঐশ্বর্যময় এ কবিতাধারায় অসংখ্য কবি তাঁদের নির্মিত ভাষায় হয়েছেন আত্মনিবেদিত। সেখানে কেউ কেউ অনেক বেশি আলোকময়, দীপ্তিপ্রবণ' (শহীদ ইকবাল ২০০৮: ১১) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০১) এমনই একজন আলোকময়, দীপ্তিপ্রবণ কবি। লুইপা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যের আঙ্গিক, বিষয়বস্তুতে নানামাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে দেশের মানচিত্রের কাঠামো ও শাসকগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থায়। অনিবার্যভাবে এগুলোর প্রভাব পড়েছে সাহিত্যে। নির্মিত হয়েছে নতুন নতুন সাহিত্যকর্ম; বিচিত্র বৈচিত্র্যে ভরে গেছে বাংলা সাহিত্যসম্ভার, প্রস্ফুটিত হয়েছে শতদল শতশুদ্ধ ধারায়। তবে আলোচনার প্রথমেই আদি চর্যাপদের মহান বাঙালি কবি ভুসুকুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বাঙালিত্বের চেতনা দিয়ে যে মহান কবি আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে উচ্চারণ করেছিলেন— 'ভুসুকু তুই আজ বঙালি ভইলি' (প্রণব চৌধুরী, ফেব্রুয়ারি ২০০১: ১২৫)

বাঙালির যাপিত জীবন সংগ্রামমুখর, রক্তক্ষয়ের, ত্যাগের। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সূর্য প্রথম অস্ত যায়। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের সাথে সাথে জেঁকে বসে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসী থাবা। প্রায় দু'শ বছর বৃটিশদের শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বাঙালির

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা

অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয় বহুবার। এ সংকট আরও ঘনীভূত হয় ১৯৪৭ সালে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠিত হলে। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে ব্যবধান হাজারেরও অধিক মাইল, সমাজ-সংস্কৃতিতে বিস্তর ব্যবধান। পূর্বাংশের ওপর পশ্চিমাংশের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার— এ সব মিলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে তীব্র অসন্তোষ ও গণরোষ দানা বাঁধে। ফলে ঘটে যায় পর্যায়ক্রমে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া এ সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে ও ভাবনায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভিত্তি করে, রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন ও সমৃদ্ধ হয়ে যে সব কবি বাংলা কাব্যাঙ্গনে সতত সচেষ্ট ও প্রতিরোধ-প্রতিবাদে সোচ্চার— তাঁদের মধ্যে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ অন্যতম। তাঁর কবিতার উপাদান ও উপকরণ সতত স্বদেশ-সংশ্লিষ্টতায় শিল্পোত্তীর্ণ।

কবিতা প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান বলছেন— 'আন্তর্জাতিক আদর্শে আমাদের কাব্যের মুক্তি নেই। আমাদের কাব্যকে বাঁচতে হলে প্রথমে জাতীয় হতে হবে। প্রথমত দেশ গ্রহণ না করলে, দেশীয় লোকের প্রাণের বস্তু হতে না পারলে এর কোন মূল্য নেই। তাই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো এই-কবি তাঁর বিশিষ্ট যে প্রতিফলন তুলে ধরবেন তাঁকে মূলত দেশকালপাত্র উদ্ভুত হতেই হবে।' (হাসান ২০০০: ৪১) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর কবিতা তাঁর 'স্বদেশ ও স্বকাল' (শহীদ ইকবাল ২০০৮: ৩৪) সংলগ্ন। তিনি পঞ্চাশের দশকের কবি। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর থেকে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে এক রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালে এ সংকট আরো ঘনীভূত হয়। বাঙালি জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য বাংলার ছেলেরা রাজপথে নেমে পড়ে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। শাসকগোষ্ঠীও বসে থাকে নি। বুলেটের আঘাতে কেড়ে নিয়েছে তাজা তাজা প্রাণ। এ সময় রাজনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির উপর ভয়াবহ নিপীড়ন নেমে আসে। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সচেতন বাঙালি বসে থাকে নি। বসে থাকে নি বাংলার কবিরা। তৈরি হয় বাংলা কবিতার নতুন পটভূমি। এ সময়ের একজন রাজনৈতিক সচেতন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা বাংলা কবিতায় নতুন দিগন্তের আলোকময় আভা চিহ্নিত করে। সমকালীন প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ তাঁর কাব্যে এক ভিন্ন স্বাদেশিক মাত্রা সংযুক্ত করেছে। 'তাঁর কবিতায় স্বদেশ আর সমকাল বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় শিল্পিত হয়েছে। সময়ের প্রবহমানতায় অতীতের গৌরব গায়ে মেখে তিনি পৌঁছুতে চান ভবিষ্যতের অমরাবতীতে।' (একুশের স্মারক গ্রন্থ ২০০২: ১৪৩) ইতিহাসজ্ঞান আর স্বদেশ সংযুক্তিতে স্বদেশ অনুরাগে সিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'সাতনরী হার' (১৯৫৫)। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর কাব্যিক শক্তির মহত্ত্ব ও সমকালীন রাজনৈতিক সচেতনার সমন্বয়ে বাংলা কাব্যভাণ্ডার হয়েছে সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এ সময়ের শক্তিমান কবি। তাঁর কবিতা ইতিহাসের মাত্রায় যুক্ত-পঞ্চাশের কবি-ব্যঞ্জনায়, বাক-বৈদগ্ধ্যে ও ব্যক্তিত্বে অসাধারণ। মা ও মাতৃভূমিকে তিনি বিপুল করে তোলেন সমকালীন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। আর ক্রমশ হয়ে ওঠেন ঔপনিবেশিক মুক্তির পরে জাতীয় চেতনা সৃজনের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর কবিতা মাতৃভূমির সংবেদনা ও বন্দনার সুর যোজনায় এক হৃদয়স্পর্শী সংগীত হয়ে ওঠে। পূর্ণাঙ্গ স্বদেশী ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ও শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা তিনি হৃদয়সূত্রে উপলব্ধি করেন আর কবিতার আঁচলে ভাষিক রূপ দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত 'মাগো, ওরা বলে' কবিতাটি একটি অসাধারণ কবিতা। মা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা এক কথায় স্বদেশপ্রেমকে কবি তাঁর হৃদয়ের গভীরে ধারণ করেন এবং ধ্বনির পর ধ্বনি দিয়ে গাঁথেন তার কবিতার মঙ্গলসূত্র।

মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা,
তাই কি হয়?
তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য
কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ৩০)

'নিশ্চিতভাবে কাব্যে কবির মনকেই আমরা আস্বাদন করি; তাঁর আবেগ, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর দেখা, প্রেম-অপ্রেম, সুন্দর-অসুন্দর, সম্পর্কে তাঁর রুচি। কবিতার তত্ত্বে কবির মন আধিপত্য না লাভ করলে কবিতা কবিতাই নয়। মূলত কবি কাব্যে নিজেকেই প্রকাশ করতে চান। নিজেকেই নিজের মনোভাবনা বা বিশেষত্বপ্রবণ মনকে, যাকে সামগ্রিকভাবে জীবনদৃষ্টিও বলা যেতে পারে।' (হাসান ২০০০: ১৩) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতায় তাঁর জীবনদৃষ্টি, স্বদেশপ্রীতির ব্যাপ্তি ও গভীরতা, শৈল্পিকবুনন সিদ্ধিতে সততাই পরিশুদ্ধ এবং স্বদেশ সমার্থক ও রাজনৈতিক সচেতনার্থক। 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান এই বস্তুজগতের অন্তরালে এক অসীম রহস্যময় অলৌকিক জগৎ বিদ্যমান। কল্পনাপ্রতিভার সহায়তায় কবির কাছে সে জগৎপ্রত্যক্ষ হয়। কবি সেই অন্তদর্শনের বিষয় তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেন।' (দীপ্তি ত্রিপাঠি ১৯৫৮: ১৩) ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে কাব্য বীজ হিসেবে গ্রহণ করে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর বাংলা কাব্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হন স্বাদেশিকচেতনায় স্নাত হয়ে। তাঁর মানবিক চেতনার উৎসারণ হৃদয়ের তলদেশ হতে। তিনি সব সময় শিকড় সংলগ্ন, ঐতিহ্য অনুসন্ধানী এক মহৎ কবি। তবে সমকালকে তিনি সব সময় কাব্যের ভাঁজে গ্রথিত করে রাখতে সিদ্ধহস্ত। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন শব্দ সৈনিক, শাব্দিক বিন্যাসে

কবিতার জমিনে তিনি চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। কবিতায় চিত্রকল্প সম্পর্কে কবি ও গবেষক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন— 'কবিতার উপাদান শব্দ। চিত্রকলার মতো কবিতায়ও শব্দের উপাদানগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনও একাকার হয়ে, কখনও তুষারের মতো গলিত হয়ে একটি রূপ বা প্রতীক নির্মাণ করতে পারে।' (আহসান ২০০১: ১৫) কুমড়ো ফুল, সজনে ডাটা, ডালের বড়ি, (মুহম্মদ হায়দার ২০১২: ৯১) শকুনী, ব্যবচ্ছেদ, কথার ঝুড়ি, চৈত্রের রোদ, রক্তজবা, কমলের চোখ— এ রকম অসংখ্য শব্দের সংশ্লেষে একদিকে কবি লোকজ উপাদানকে ছুঁয়ে যান, আর সঙ্গে সঙ্গে পাকশাসনের ছোবলে বাঙালি মায়ের রক্তক্ষরণ-এ এক নির্মম অথচ করুণ বাস্তবকে শব্দের বন্ধনে ছন্দবদ্ধ করেন। এভাবে নির্মাণ আর পুনর্নির্মাণের মিথস্ক্রিয়ায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর কাব্যচর্চা শৈল্পিকবুননে ক্রমাগত সুসংহত শৈল্পিক পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠীর শকুনী আচরণে আমাদের সন্তান আমাদেরই উঠানে মায়ের চোখের সামনে নির্মম পরিণতিকে বরণ করে নেয়। এ প্রসঙ্গে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর কবিতায় বলছেন—

ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠানে উঠানে
যেখানে খোকার শব
শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করে। (কবিতা সমগ্র, ১৯৯৯: ৩১)

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতা প্রসঙ্গে ড. শহীদ ইকবাল বলেন— 'সন্তানের জন্য মায়ের অপেক্ষা কিংবা মায়ের শাশ্বত গৌরব কবিতায় প্রতিফলিত করে তোলেন এবং এ অনুষঙ্গি ধারাটি সৃজন করে পৌঁছে দেন বাংলাদেশের কবিদের কৃতাঞ্জলিপুটে। এক পর্যায়ে তাঁর কবিতা চর্চায় বাঁক বদল হয় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' থেকে। আর ক্রমশ হয়ে ওঠেন ঔপনিবেশিক মুক্তির পরে জাতীয় চেতনা সৃজনের স্বপ্নদ্রষ্টা, অনুসন্ধান করেন তাঁর স্বপুরুষকে, সাহসী পুরুষকে— যারা স্বদেশের তরে নির্ভীকভাবে জীবন-যৌবন বিলিয়ে দিতে পারে, উপযুক্ত প্রতিঘাত করতে সক্ষম— এমন পুরুষের জন্য প্রার্থনা। 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কবিতাটি তাঁর প্রমাণ। এতে ভূমি-মাতৃকার অস্তিত্ব-সংবেদনা এক নিজস্বতায় পর্যবসিত। কবি সেখানে ইউরোপীয় নন কিংবা বহির্দেশীয় কিছু আরোপ করে নয়— পূর্ণাঙ্গ স্বদেশি ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে নিজস্বতায় বর্ণিল করেছেন।' (শহীদ ইকবাল ২০০৮: ৩৪) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন রাজনৈতিক সচেতনায় সমৃদ্ধ অরাজনৈতিক কবি ব্যক্তিত্ব। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা সম্পৃক্ত কবিতাগুলো দ্বীপশিখার মতো চতুর্দিকে আলো ছড়ায়; কাব্যপাঠককে পথনির্দেশ করে; আর সেই সাথে অনিবার্যভাবে নির্দেশিত হয় ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল। 'স্বদেশ-স্বকাল বার্তাকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কবিতায় সংহতভাবে সংযুক্ত করে একটি কাব্যিক আলোকবর্তিকা সমুন্নত করেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা দীপশিখার মতো আলো ছড়ায়। আলোকিত করে পাঠকের হৃদয় ও মনোরাজ্য। বিশেষ করে 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কবিতাটিতে 'বৃষ্টি' ও 'সাহসী পুরুষ' যেন প্রফেটিক ভাষ্যে উদ্ভাসিত। একটা আলোকবর্তিকা ও আর

প্রত্যাবর্তনকামী পুরুষ— সে যেন ফিরে এসেছে অপাপবিদ্ধ চেতনায় সামূহিক শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য।' (শহীদ ইকবাল ২০০৮: ৩৪)

স্থিতধী বৃক্ষের মত
উর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করেছি
আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি।
(কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ১০৫)

১৯৪৭ সালে বিভাগ-উত্তরকালে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আমাদের সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন— 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। দীর্ঘ সিকি শতক ধরে নিজেকে শনাক্ত করার যে সাধনায় বাংলাদেশের কবিরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, তার সাফল্যে কবিতার ভাব-ভাষা-বাক-প্রতিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর কালে এসেছে নতুন মাত্রা। বিষয় ও ভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের কবিতায় যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে; তেমনিই কবি-ভাষা এবং উপমা রূপক-উৎপ্রেক্ষা সৃজনেও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থিত। আমাদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। কখনও সরাসরি যুদ্ধকে অবলম্বন করে কবিতা রচিত হয়েছে; কখনও বা কবিতার ভাব সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে। কোনো কোনো কবিতায় স্বাধীনতার স্বপক্ষীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং বিপক্ষীয়দের প্রতি ঘৃণাবোধ উচ্চারিত হয়েছে।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০০৯: ১৩) আবার কখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দাসত্বের কথা বলেছেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একজন ইতিহাসমনস্ক কবি। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আর কাব্যিকদক্ষতার সমন্বয়ে নির্মাণ করেন নতুন কাব্যইতিহাস। সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক দাসত্ব ও পরাধীন জীবনের অত্যন্ত গ্লানিময় ইতিহাসকে কবি অল্প কয়েকটি শব্দে কাব্যিক বুননে উপস্থাপন করেন এভাবে—

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি
তার পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ৯৬)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ছিল প্রত্যাশার একটি হৃদয়মাখা নাম 'গেরিলা'। গেরিলার সঠিক কোন প্রতিকৃতি বা ঠিকানা ছিল না। তারা পালিয়ে থাকত, আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতো। যখন সুযোগ পেত, তখনি আঘাত করতো। এভাবে ক্রমাগত বিজয়ের মুখে এগিয়ে চলতো। তাই তাদের চেনা কঠিন ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ তাদেরকে চিনেছে। তারা জটাজালধারী কেউ নয়। কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) তাদেরকে 'তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার' (শামসুর রাহমান ১৯৮৫: ৯৩) বলে সম্বোধন করেছেন। গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবিতা

রচনা করেছেন। 'গেরিলা' যোদ্ধাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে কবি ভালবাসেন। তিনি কবিতায় বলছেন—

রোদ নেভা আর বাতি জ্বলার
মাঝখানের সময়টা
সন্ত্রস্ত ও অস্থির
রাস্তা ঘাট ঝলমল করে ওঠার আগে
আমার ভাইকে পালিয়ে যেতে হবে। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ১২১)

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা রাতে গোপনে স্বজনদের সাথে দেখা করতে আসে। আবার প্রভাতের পূর্বেই পালিয়ে যায়। এ গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা কবিতায় নানা কবির নানা কাব্যে নানা রকমবৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। গেরিলাযুদ্ধ যেমন স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। 'মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটা প্রধান কারণ ছিল— ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের কার্যক্রম। গেরিলারা দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শত্রুদের হতাহত করতেন এবং নিজেরাও প্রাণ বিসর্জন দিতেন। তাদের এই সাহস ও ত্যাগের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টান্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিবলি— যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। আরও পাঁচ জন গেরিলা নিয়ে তিনি সারদার পুলিশ একাডেমির পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর এক দারুণ হামলা চালান। সেখানে ছিল ৩২ নম্বর, পাঞ্জাবি রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য। শিবলি ও তার বন্ধুরা চুপে চুপে শত্রুদের বাঙ্কারে ঢুকে পড়ে। তারপর বাঙ্কারের মধ্যেই গ্রেনেড ফাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে তারা সৈন্যদের আসল ঘাঁটিতেই ঢুকে পড়ে। সেখানে হয় সামনা-সামনি যুদ্ধ। দশজন পাকিস্তানি নিহত হলেও, গেরিলাদের চারজন সেখানেই নিহত হয়। একজন পালিয়ে যায়, আর ধরা পড়েন শিবলি; মুক্তিযোদ্ধাদের খবর বের করার জন্য সৈন্যরা তার উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তারা একটা একটা করে তাঁর চোখ এবং দাঁত তুলে নেয়, কিন্তু শিবলি মারা গেলেও কোন খবর বলেনি।' (গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি ২০১০:১২৪-১২৫)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মানবতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে মেতে উঠেছিল গণহত্যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন পাকিস্তানি সৈনিকের পাশবিক হত্যাকাণ্ডে। অসংখ্য নারী ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছে। নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ এ পাশবিক নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে নি। ভাইয়ের সামনে ভাইকে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু সহোদর ভাই কবরের মতো নিশ্চুপ হয়ে থাকে। এমনই শ্বাসরুদ্ধকর সময়; সবাই ছিল অসহায়। নিরস্ত্র বাঙালির অসহায়ের দৃশ্য কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ উপস্থাপন করেন এভাবে—

আমার ভাইকে
চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়

আমি আমার মায়ের কবরের মত
চুপ করে থাকি। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ১২৫)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতা প্রসঙ্গে ড. শহীদ ইকবাল বলছেন— 'আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতা মৃত্তিকা সংলগ্ন। সেখানে ব্যক্ত হয় আশাবাদ। কবিতার শিল্পগুণ স্বতঃস্ফূর্তপ্রবাহে, পরিচিত ভাষ্যে, অসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বচেতনায় প্রলুব্ধ। কাব্যমণ্ডলীতে কবির মৃত্তিকালগ্ন অনুরাগ বিকশিত হয়ে পুরাণমোহে আবৃত–যা তাকে একটু এগিয়েই দেয়, অন্য কবিতাধারা থেকে।' (শহীদ ইকবাল, ২০১৩: ১৬৫) সত্যিই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর কাব্যিক সত্তার বিকাশ ও লেখনীরীতির দীপ্যমানতায় নিঃসন্দেহ স্বাতন্ত্র্যিক ধারার অধিকারী। 'ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা রচনা করে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলা কাব্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন। এসব কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এক প্রকার সফল নিরীক্ষা ছিল।' (মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, এপ্রিল ১৯৭৯: ৩৮৯) তবে লেখকের কাব্য আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পটভূমিকা। 'মুক্তিযুদ্ধ জীবনকে প্রভাবিত করেছে, জীবনের সেই প্রভাব সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকে লেখকের প্রতিটি বিষয়ের লেখাতেই, হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষভাবে, মুক্তিযুদ্ধ-প্রভাবিত জীবনের ও চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। সঠিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে, মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্যকে প্রভাবিত করে নি, করেছে জীবনকে।' (ফজলুল হক, জুন ১৯৯৫: ৫৩) '১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে আমাদের সাহিত্যের প্রধান ধারা লেখকদের সাহিত্যদৃষ্টি বদলে গেল। গণসাহিত্য, গণসংস্কৃতি, বিপ্লবী সংস্কৃতি, জীবনবাদী কিংবা জীবনমুখী সাহিত্য-সংস্কৃতি এ সব কথা প্রাধান্য বিস্তার লাভ করলো।' (ফজলুল হক, জুন ১৯৯৫: ৫৮) মুক্তিযুদ্ধের সময় সবার ভূমিকা সমান ছিল না। কিছু মানুষ যুদ্ধের সময় পালিয়ে যায়, দেশ স্বাধীন হলে ফিরে আসে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিশে যায় অথবা আবার মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়— এ রকম সুবিধাবাদীদের সংখ্যা একবারে কম নয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতায় এ সমস্ত সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী মানুষের চারিত্রিক স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এভাবে—

তিনি অবশ্য পালিয়ে যান
কাছের প্রবাস থেকে বহুদূরের প্রবাসে
এবং যখন তিনি ফিরে আসেন
তখনো উচ্চকণ্ঠ
তবে পলিমাটির বিরুদ্ধে। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯ : ১৬০)

মুক্তিযুদ্ধ একই সাথে আমাদের সুখ ও দুঃখের স্মৃতি। দুঃখের দিকটা হলো-মা মরা ছোট ভাই মৃত মায়ের উপর হামাগুড়ি দেওয়া, ছেঁড়া অঙ্গ, পোড়া চোখ, দুই বছরের ছোট শিশুর ফুসফুসের হাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, কমলের ডান চোখ ছিঁড়ে যাওয়া, পুকুর ঘাটে রমণীর নগ্ন শরীর, 'ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ছেট্টি তারা/ কোথায় আছ আমি যে পাইনে সাড়া'

(কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ৮৫) স্বজন হারানোর এ রকম অন্তহীন-অসীম বেদনা কবি নিজের হৃদয়ে অনুভব করেন, অপরের সঙ্গে স্থাপিত আত্মিক সংযোগের হার্দিক অনুভূতি বর্ণমালার আশ্রয়ে কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেন। আর সুখের দিকটা হলো লাল-সবুজের পতাকা- সবই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতায় এক শৈল্পিক শিল্পকাঠামোয় শিল্পিতরূপে রূপায়িত হয়েছে। এখানে কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি উল্লেখ্য—

ঠিক একই সময়ে
মরা মা ছোট ভাই এবং তার বন্ধুরা
হামা দেয়,
মায়ের ভিটার মেঝেতে নয়
হত্যা এবং ঘাতকের অলিন্দে।
অনেকে ফিরে আসে না
সুফলা পলির মত মাটির ঘরে শুয়ে থাকে,
যারা ফিরে আসে
তাদের চোখে লাল গোলাপের সূর্য। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ১৬০)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতা জীবনঘনিষ্ঠতার সংস্পর্শে ও ছোঁয়ায় জীবন্তরূপে, কাব্যিক ছন্দে ও আবহে ছন্দবদ্ধ, স্বাদেশিক চেতনার সংযোগ ও সংরাগে, এক বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত। 'সাহিত্যে realism বা বাস্তববাদ বলতে সাধারণভাবে জগৎ ও জীবনের যথাযথরূপের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিকে বোঝায়। মহৎ সাহিত্য জীবনাশ্রয়ী সন্দেহ নেই। সে কারণে জগৎ ও জীবনের নানাবিধ সমস্যা, মানবজীবনের উত্থান-পতন ও জয়পরাজয়ের কাহিনি যখন সাহিত্যিকের মানসচেতনায় পরম সত্যরূপে ধরা পড়ে এবং তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তখন সেই প্রয়াস যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে।' (আজহার ইসলাম, ১৯৮৫: ১৩) এই দিক থেকে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতার কাব্যিক মর্যাদা একটি শৈল্পিক সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, কবিতা দিয়ে কোন বিপ্লব হয় না— এ কথা হয়তো বা সত্য। তবে কবিতা বিপ্লবকে অনেকটা এগিয়ে নিতে পারে। পারে এর তেজস্বিক গতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করতে, সামূহিক সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করতে, সম্ভাব্য সার্থক পরিণতি ও ফলাফলকে জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলতে। 'শব্দের শক্তি অজেয়, কী এর সাধ্য, আর অসাধ্য- কতখানি অর্থকে সে নিজের কবলে আনে, নিজেই যথাসময়ে তা ছড়িয়ে দেবে বলে, কেমন করে তাকে নতুন তাৎপর্যে দীপ্যমান করা যাবে, আপন নৈঃসঙ্গের মুখোমুখি হয়ে, তারই মার খেতে খেতে কবিরা তা উপলব্ধি করলেন। তখনই বুঝলেন বচনকে সেই অবধি নিয়ে যেতে হয় যেখান থেকে অনিবর্চনীয়ের আরম্ভ। শব্দ যেখান থেকেই বহু অনুষঙ্গের পরিষদবর্গের সমভিব্যাহারে তার সীমা ভাঙ্গার যাত্রা করে— সে রাজার ললাটে কবি নিজে রাজপুরোহিতের মত পরিয়ে দেন কল্পনার অভিজ্ঞান টীকা। শব্দই তখন শব্দচিত্র হতে হতে

আপন রাজাধিকারের প্রতীক হয়ে ওঠে।' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্টোবর, ২০০০: ১৮০) কবিতা বিপ্লবকে কতটুকু প্রেরণায় উদীপ্ত করে, শ্লোগানকে শাণিত করে, স্বদেশচেতনায় স্নাত হার্দিক অনুভূতিকে স্বর্গীয় আলোকে প্রদীপ্ত করে-এর প্রামাণিক কাব্যিক রূপায়ণ আমাদেরকে অভিভূত করে। এখানে প্রাসঙ্গিকতার কাব্যিক রূপায়ণ হয়েছে এভাবে—

যখন রাজশক্তি আমাদের আঘাত করলো
তখন আমরা প্রাচীন সংগীতের মত
ঋজু এবং সংহত হলাম।
পর্বত শৃঙ্গের মত
মহাকাশকে স্পর্শ করলাম।
দিকচক্রবালের মত
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলাম;
এবং শ্বেত সন্ত্রাসকে
সমূলে উৎপাটিত করলাম।
তখন আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের মত
উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত হলাম। (কবিতাসমগ্র, ১৯৯৯: ৯৮)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর কবিতা মন্ত্রের মত অমোঘ উচ্চারণ। তাঁর কাব্যিক স্ফুরণ বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। শুধু কবিতায় নয়, তিনি সরাসরি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক ও প্রাবন্ধিক গোলাম মুরশিদ বলেন— '১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বটতলা থেকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হয়। দলে দলে ছাত্ররা রাস্তায় বেরিয়ে আসে, প্রথম যে দলটি রাস্তায় বের হয়, তার নেতৃত্ব দেন হাবিবুর রহমান। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ইবরাহিম তাহা ও আব্দুস সামাদ। তৃতীয় দল নিয়ে বের হন আনোয়ারুল হক খান এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।' (গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি; ২০১০: ৩৮) তাঁর কবিতা বাঙালির সংগ্রাম, সংগঠনে, মুক্তির চেতনার প্রদীপ্ত ভাষ্যে উজ্জ্বল। তাঁর কবিতার সুভাসিত মানবিক অধিকারচেতনা আমাদের সব সময় উদীপ্ত করে রাজনৈতিক চেতনায়।

সহায়কগ্রন্থ:

১. শহীদ ইকবাল, আগস্ট ২০০৮, *বাংলাদেশের কবিতার ধারা ও সংকেত*: চিহ্ন, শহীদুল্লাহ কলা ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. হাসান হাফিজুর রহমান, আগস্ট ২০০০, *বাংলাদেশের কবি ও কবিতা*: সময়, বাংলাবাজার. ঢাকা-১০০০।

৩. *একুশের স্মারক গ্রন্থ* (সেলিনা হোসেন ও অনান্য সম্পাদিত) ২০০২, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০।

৪. *কবিতাসমগ্র*, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জানুয়ারি ১৯৯৯, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৫. দীপ্তি ত্রিপাঠি, আগস্ট ১৯৫৮, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*: দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩।
৬. সৈয়দ আলী আহসান, আগস্ট ২০০১, *আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে*: গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭. মুহম্মদ হায়দার, জুন ২০১২, *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*: বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বইমেলা ২০০৯, *বাংলাদেশের সাহিত্য*: বাংলা বাজার, ঢাকা, ১১০০।
৯. শহীদ ইকবাল, একুশে বই মেলা ২০১৩, *বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস ১৯৪৭-২০০০*: রোদেলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
১০. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, এপ্রিল ১৯৭৯, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*: আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১১. প্রণব চৌধুরী (সম্পাদিত), ফেব্রুয়ারি ২০০১, *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা পর্যালোচনা ও অনান্য প্রবন্ধ*: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১১০০।
১২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, জুন ১৯৯৫, *সাহিত্য চিন্তা*: বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৩. গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি ২০১০, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর (একটি নির্দলীয় ইতিহাস)*: প্রথমা প্রকাশন, ১০০, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
১৪. আজহার ইসলাম, ডিসেম্বর ১৯৮৫, *সাহিত্যে বাস্তবতা*: বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্টোবর ২০০০, *বাংলা কবিতার কালান্তর*: দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।
১৬. *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, মার্চ ১৯৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩।